*Journal of Cultural Research Studies, Vol-III Issue-1(2024), p73-84. (*ISSN 2583-6137)
A Blind Peer-Reviewed International Multidisciplinary Online Open Access Journal.

সেকালের গ্রামীণ বিনোদন

ড.প্রজ্ঞাপারমিতা রায়

সহকারী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, শিরাকোল মহাবিদ্যালয়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
Email: prajnaroy22312@gmail.com

সারসংক্ষেপ:

'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে'

আনন্দ ছাড়া কোনো জীবই বাঁচতে পারে না। সভ্য বা অসভ্য যে জাতিই হোক না কেন তাদের আনন্দ ও ফুর্তির প্রকাশ- উৎসব, ক্রীড়া-কৌতুক ও নৃত্য-গীতের মাধ্যমে হয়ে থাকে। শিশুরাও জাগরণে যেমন হাত পা ছোঁড়ে, স্বাদু আওয়াজ করে, নানা রকম খেলা করে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও তারা 'দেয়ালা' করে। কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে আমোদ বা বিনোদনে অংশ নেয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমোদের ধরন পালটায়।

গ্রাম, নগর, অরণ্য পার্বত্যাঞ্চলে এইসব বিনোদনের রকম আলাদা। কোনো বিনোদন নগরে জন্ম নিয়ে গ্রামে ঠাঁই নিয়েছে। আবার কোনোটা গ্রাম থেকে শহরে এসেছে। কারো কারো অবস্থান শহর ও গ্রাম দুই স্থলেই। কতক বিনোদন গুপ্ত, অপ্রকাশ্য আবার কতক প্রকাশ্য-সর্বজনীন। বিনোদনের জন্ম ধর্মাধর্ম ও কর্মাবকাশের কারণে। অনেক প্রথা-আচারই তো বিনোদন। যেমন- আদিবাসীদের শিকার পরব। গান, নাচ, নৃত্য-গীত, পাঠ, পশুপাখির লড়াই, গল্পগাছা, খেলাধুলা এবংবিধ বিনোদন সবই সামাজিক, ধর্মীয়, পরিবেশগত, ইতিহাস ও আর্থিক কারণে সৃষ্ট। ধর্মীয় আচার ও প্রচার বিনোদনের এই দুটি দিক। জাতিগত, ধর্মগত, গোষ্ঠীগত ও ব্যক্তিগত নানান বিনোদনের বৈচিত্র্য যুগে যুগে কালে কালে মানুষকে আকৃষ্ট করেছে।যুগে যুগে বিনোদনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন হয়েছে। গ্রামীণ বিনোদনকে পিছনে ফেলে যুক্ত হয়েছে এফ. এম, টেলিভিশন,পাশাপাশি ভিডিও গেম, সোশ্যাল মিডিয়ার হরেক কিসিমের বিনোদন। তবু ফেলে আসা গ্রামের আনন্দ অনুষ্ঠানের কোন তুলনা হয় না। এর মূল্য চিরকালীন।

সূচক শব্দ: ***পূজা-পার্বণ, উৎসব, খেলাধুলা, নাচ-গান, যাত্রা-পাঁচালি***

ভূমিকা:

'গ্রাম' শব্দটি উচ্চারণের সাথে সাথে অনেকের মনেই প্রশান্তি তৈরি হয়-শান্ত, স্নিগ্ধ, আনন্দমুখর এক পরিবেশ। নগরায়ণের ফলে অনেক গ্রাম লুপ্ত হয়েছে বটে তবে জনবিস্ফোরণে অনেক নতুন নতুন গ্রামও গড়ে উঠেছে।

এখনও আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করে। সব গ্রাম এক রকমের হয় না-অবস্থান,পরিবেশ, প্রকৃতি অনুযায়ী গ্রামের রকমফের আছে। গ্রামের মানুষজন বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রকম। অধিকাংশ গ্রামে চাষির বাস। কিন্তু এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে কামার, কুমোরের সংখ্যা বেশি। সারাবছর নিজের জাতব্যবসা চালিয়ে তাদের জীবিকা নির্বাহ হয় না। তাই তারা খানিকটা চাষ খানিকটা নিজের ব্যবসায়ের উপর নির্ভর করে। শিল্পপ্রধান গ্রাম ছাড়া ব্রাহ্মণপ্রধান পাড়া, কায়স্থপাড়া, সাঁওতালপাড়া, হাড়িপাড়া, মুচিপাড়া যেমন আছে তেমনি মুসলমানদের মসজিদ ও মক্তবযুক্ত গ্রামেরও অভাব নেই। এই বিভিন্ন জাতি, উপজাতি সমন্বিত গ্রামীণ সমাজে বিভিন্ন রকম পূজা-পার্বণ, রীতি-নীতি আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত। এর ফলে গ্রামীণ মানুষদের আমোদ-প্রমোদের ধারাটিও বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রকম। এখনকার গ্রামীণ সমাজ পরিবেশ দেখলে ধারণাই করা যায় না সেকালের গ্রামীণ মানুষের সহজ-সরল জীবনযাত্রার কথা। জাত-পাত, শ্রেণি-বর্ণবিভাগ সেকালের গ্রামীণ সমাজে ছিল তবে তার সঙ্গে যুক্ত ছিল অনাবিল আনন্দের নানান উপকরণ। ক্রমশ আমাদের দেশ শহরমুখী বা নাগরিকজীবন অনুকরণবর্তী হয়ে পড়ে। ফলে গ্রামীণ জীবনধারা পাল্টে যায়, পাল্টায় বিনোদনের পদ্ধতিও। যদিও আমোদ-প্রমোদের বিষয়টি যুগের সঙ্গে পরিবর্তনশীল। এমন অনেক আমোদ-প্রমোদকারী উপকরণ আছে যা আবহমানকাল ধরে চলে আসছে। আবার নতুন নতুন উপকরণ সংযোজিত হচ্ছে সময়ের হাত ধরে। উনিশ শতকে ইংরেজ অনুগ্রাহী বাবুদের আনন্দ-ফুর্তির ধারাটি এখনও আমাদের বিস্মিত করে। বাবুরা মূলত শহরেই আমোদ-প্রমোদ করত। এইসময় শহর কলকাতায় কবিগান, যাত্রাগান, বাইজীনাচ, আখড়াই, হাফ আখড়াই, প্রভৃতির জোয়ার আসে। পূজা, বিবাহ, অন্নপ্রাশন বা নিছক আনন্দ-ফুর্তির জন্য এই ধরনের প্রমোদের ব্যবস্থা করা হত। এই আমোদ-প্রমোদের ব্যাপারটি ক্রমশই গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এছাড়া পল্লিগ্রামেও সেসময় জমিদার বা একশ্রেণির বাবু ছিলেন যারা শহরের এই আমোদ-প্রমোদের ধারাটি গ্রামে নিয়ে আসেন।

বিষয়বস্তুর বিস্তার:

ক

বরোমাসে তেরো পার্বণের দেশ বাংলাদেশ। এখানে ঋতু বৈচিত্রের সাথে সাথে উৎসব বৈচিত্রের আনাগোনা। এখানে অনুষ্ঠান অর্থে পূজা পার্বণ ও সঙ্গীত। নাচ, গান, বাদ্য, মন্ত্র, ভোজন, খেলাধুলা ইত্যাদি বাঙালির উৎসব অনুষ্ঠান। উৎসব শহরে এবং নগরে সব জায়গাতেই হয়। সেকালে এমন অনেক উৎসব ছিল যা শহর এবং গ্রাম উভয় পরিবেশেই পালিত হত, যেমন চড়ক, দুর্গাপূজা, ঈদ। তবে পল্লি উৎসবগুলি মূলত গ্রামেই পালিত হত যেমন মনসা, ভগবতী যাত্রা।

পল্লি উৎসবগুলি গ্রামীণ মানুষের ধ্যান ধারণার, বিশ্বাস, ধর্ম মোক্ষের প্রতিশ্রুতি। গ্রামের সাধারণ নরনারী যুগযুগান্ত ধরে পুরুষানুক্রমে বাংলাদেশে এ সকল লৌকিক উৎসব পালন করে আসছেন। তবে একথা ঠিক যে উৎসব বলতে শুধু আনন্দমূলক স্ফূর্তিই বোঝায় না। বাংলাদেশে শোকব্যঞ্জক বিষয় নিয়েও উৎসব পালিত

হয় যেমন মহরম। অনাবৃষ্টির দিন মাটি পুড়ে ফসল নষ্ট হয়ে গেলে সেকালে গ্রাম্য মেয়েরা উলঙ্গ হয়ে নাচ গানের মাধ্যমে ভোজউৎসবে হৈ হৈ করে, যার নাম 'হুদুমা', তাই মনে হয় বাঙালি উৎসব অনুষ্ঠানের বেলায় কাঁদতে জানে না, জানে কেবল হাসতে। সে কারণেই প্রাচীন কবি বলেছিলেন, এতভঙ্গ বঙ্গদেশে তবু রঙ্গভরা'।

বছরের শুরুতেই নববর্ষের আনন্দে পল্লিগ্রাম এক সময় আনন্দে মেতে উঠত। এই দিন হিন্দুদের 'ভগবতী যাত্রা'। ভগবতী স্বরূপ গাভীকে পল্লি বালক বালিকারা এই দিন যত্নাদিন করে এবং উৎসবে মেতে ওঠে। 'সাহিত্য' পত্রিকায় এই উৎসব সম্পর্কে লেখা হয়-

> "১লা বৈশাখ নববর্ষের প্রথম দিন পল্লীগ্রামের অভিনব সজ্জা দেখিতে পাওয়া যায়। উৎসবরে দিনে বালক বালিকা যেমন উজ্জ্বল পরিচ্ছেদে সজ্জিত হইয়া উৎসাহ প্রদীপ্ত হৃদয়ে উৎসবানন্দে মত্ত হয়, এই দিন সেইরূপ গ্রামখানি যেন নবজীবন লাভ করিয়া আঘাত বেদনাপরিপ্লুত বিষাদস্মৃতিসমাকূল পুরাতন বর্ষের দুঃখদৈন্যলাঞ্ছিত জীর্ণ যবনিকা পশ্চাতে রাখিয়া অভিনব বেশে নববর্ষের নূতন উৎসব আরম্ভ করে ভগবতীযাত্রা তাহারই উদ্বোধন।"[১]

ভগবতী যাত্রার পর দশহরা গঙ্গাপূজা, স্নানযাত্রার মেলা। এই স্নানযাত্রার মেলা একসময়ে শহরের বাবুরা ধুমধাম করে পালন করত। বড় বড় বাবুরা পিনেস, কলের জাহাজ, বোট ও বজরা ভাড়া করে মাহেশে যেতেন। গঙ্গায় বাচ খেলা হত, স্নানযাত্রার পর রাতে খেমটা ও বাইয়ের হাট বসত। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত স্নানযাত্রার উৎসবটি শহরকেন্দ্রিক ছিল। উনিশ শতকে স্নানযাত্রার আয়োজন কমে আসে এবং পল্লি গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। এই স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে গ্রামের ছেলে মেয়ে সকলে মিলে আনন্দে মেতে ওঠে। কালীপ্রসন্ন সিংহ লিখেছেন-

> "স্নানযাত্রার যাত্রীদের ভারী ধূম পড়ে গ্যাছে, বুড়ী মাগী, কলাবউয়ের মত আধ হাত ঘোমটা দেওয়া ক্ষুদে ক্ষুদে কনে বউ বুকের কাপড় খোলা হাঁকরা ছুঁড়িরা রাস্তা জুড়ে শ্বশুর, ভাতার, ভাদ্দার বউ ও শাশুড়িতে একত্র হয়ে গ্যাচেন, জগন্নাথের কল্যাণে মাহেশ আজ দ্বিতীয় বৃন্দাবন- অনেকেই কেষ্ট সাজবেন!"[২]

রথযাত্রা ও ঝুলনযাত্রা ইত্যাদির পর আসে দুর্গাপূজা। দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে বাঙালির আগ্রহের শেষ নেই। এই সময় অনেক দিন ধরে শহরের সাথে পাল্লা দিয়ে গ্রামগুলি সজ্জিত হয়। সেকালে পল্লি বাংলায় এই উৎসবকে নিয়ে নানান ধরনের আমোদ-প্রমোদ করা হত। ষষ্ঠীর দিন গ্রামের চারিদিকে বাজনা বেজে উঠত। গ্রামের ঢাকি, বাজনদাররা অনেক আগে থেকেই প্রস্তুতি চালাত। কেউ বা শহরে চলে যেত পূজা উপলক্ষ্যে এই ব্যাপারটি এখনও লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া সমাজের সবশ্রেণির মানুষ দুর্গাপুজোয় মেতে উঠত। রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণ লিখেছেন-

> "মা ভগবতীর আগমনে সর্ব্বত্রই আনন্দে পরিপূর্ণ। বিদেশী চাকরেরা সব মাড়ুরা ব্যাগ নিয়ে বাড়ি এসেছেন; পুজোর আমোদের সঙ্গে সঙ্গেই যত সন্ধ্যার আগমন হতেছে তত তাদেরও আনন্দ বাড়চে, তারা সদানন্দে প্রিয়তমার সহিত মধুপানে যামিনী যাপন করবেন; কেউ বা ছুঁচো

> ধরে খাবেন। দেশের ছেলেরা নূতন শান্তিপুরে ধূতি ও ডুরে উড়নির বাহার দিয়ে খাতায় ঘুরচে ক্ষুদে২ ছেলেরা সাজ পরে ল্যাজ ওয়ালা পাগড়ি মাথায় দিয়ে গুরিয়া পুতুলের মত ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে। গয়লা ছুতোর, কামার ও কুমেরেরা কালাপেড়ে কোরা ধুতি ও ধোয়া ম্যুলের চাদর গায় দিয়ে চুল ফিরিয়ে বাবু সেজে বাহার মারচে। আজি তাদের ভারি আনন্দ।"[৩]

সেকালে 'কার্তিকের লড়াই' বলে এক ধরনের উৎসব হত। একালের পক্ষে এই উৎসবটি অভিনব। কার্তিক পূজার পর দিন অপরাহ্ণে গ্রামের কার্তিক মূর্তিগুলি পথে বের করে এক প্রতিযোগিতমূলক উৎসব হত যা কার্তিকের লড়াই নামে পরিচিত। এই উৎসব বেশ আড়ম্বরপূর্ণ ছিল। কার্তিক পূজার পর দিন বিকেলে বাদ্যযন্ত্র সহকারে বিভিন্ন ব্যক্তির কার্তিক বাঁশের মাচায় করে একস্থানে আনা হত। সেখানে কার্তিক সাজের রকমারি জনগণকে দেখান হত। তারপর সমস্ত গ্রাম ঘুরে কোন মন্দির প্রাঙ্গণ কিংবা কোন ফাঁকা স্থানে কার্তিকগুলিকে নামান হত 'ভারতী' পত্রিকায় এই উৎসব সম্পর্কে লেখা হয়-

> "মন্দিরপ্রাঙ্গণ, মন্দিরের সন্নিকটবর্তী তমাল-তল দেখিতে দেখিতে জনাকীর্ণ হইয়া গেল; মশাল জ্বালান হইল, বাতি, রঙমশাল প্রভৃতি জ্বালিয়া উঠিল, দুই চারিটা হাউই হুস্ হুস্ শব্দে আকাশে উঠিয়া সন্ধ্যার ধূসর আকাশে কার্তিকের বীরদর্প ঘোষণা করিতে লাগিল; এক সঙ্গে তুমুলভাবে সমস্ত ঢাক বাজিয়া উঠিল এবং বাহকেরা, হরিধ্বনি করিয়া কার্তিক ঘাড়ে তুলিয়া নাচিতে নাচিতে পুনর্বার আলোকমালাবেষ্টিত জনকোলাহলপূর্ণ বাজারের মধ্য দিয়া নদীর দিকে চলিল।"[৪]

বাংলাদেশের অধিকাংশ পল্লিতেই নবান্ন অগ্রহায়ণ মাসের একটি আনন্দপূর্ণ প্রয়োজনীয় গার্হস্থ্য উৎসব। হেমন্তের অবসানকালে নবান্নের দিন অপরাহ্নে পল্লি প্রান্তে হর্ষকলরব ও উৎসাহের অন্ত নেই। নদীতীরবর্তী সুবৃহৎ ষষ্ঠীগাছের ছায়ায় এদিন গ্রামের রাখাল, কৃষক ও মজুরেরা সমবেত হয়, আজ তাদের বর্ষব্যাপী কঠোর পরিশ্রমের পর বিশ্রামের দিন। পল্লি অঞ্চলে বনভোজন বা 'পোষলা' নামে এক ধরনের অনুষ্ঠান হত। পৌষ মাসই পোষলার উপযুক্ত সময়। এই সময় গৃহস্থগৃহে অভাব থাকে না। আকাশ নির্মল, সূর্যের কিরণ প্রীতিকর। অন্তপুরের বৈচিত্র্যহীন পাকশালা থেকে সেদিন বাড়ির মহিলাদের মুক্তি। 'সাহিত্য' পত্রিকায় এই উৎসব সম্পর্কে লেখা হয়-

> "অন্তপুরের ক্ষুদ্র পাকগৃহ পরিত্যাগ করিয়া একবার প্রকৃতি জননীর মুক্ত প্রাসাদদ্বারে আতিথ্যগ্রহণের জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠে! সেকালে বালক, যুবক ও বৃদ্ধ,- অতি অল্প লোকেই এ উচ্ছ্বাস দমন করিতে পারিত।"[৫]

বাংলাদেশে বসন্তঋতুতে দোলযাত্রা একটি জনপ্রিয় উৎসব। দোলযাত্রা আসলে ধর্মঘটিত অনুষ্ঠান নয়। এ ছিল জনসাধারণের বসন্তের উৎসব ও হৈহুল্লোড়। এর নাম 'হোলি' এসেছে যে মূল শব্দ থেকে তার থেকেই এসেছে 'হুড়োহুড়ি' হুল্লোড়- এমনই মনে করেন সুকুমার সেন। পল্লিগ্রামের বছরের শেষে অনুষ্ঠিত হয় চড়ক। চড়ককে কেন্দ্র করেও পল্লিবাংলার মানুষ মেতে উঠে। চড়ক বাংলাদেশের নিম্নশ্রেণির হিন্দুর সর্বপ্রধান পর্ব। তবে এককালে

*Journal of Cultural Research Studies, Vol-III Issue-1(2024), p73-84. (*ISSN 2583-6137)
A Blind Peer-Reviewed International Multidisciplinary Online Open Access Journal.

বেশ ঘটা করে কলকাতায় চড়ক পার্বণ হত। পল্লিগ্রামে আর সেকালের মত চড়ক দেখা যায় না। উনবিংশ শতকের শেষ দিকেই এর জনপ্রিয়তা কিছুটা হ্রাস পেতে থাকে। দীনেন্দ্রকুমার রায় বলেছেন-

> "কিছুদিন পূর্বে চৈত্রমাসের মধ্যভাগেই চড়কের ঢক্কাধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইত, এবং সেই সময় হইতেই পল্লীবাসী কৃষক ও রাখালের দল, ঘরামি, মজুর প্রভৃতি শ্রমজীবীবর্গ কাজ ছাড়িয়া গাজনের আমোদে মত্ত হইত। আজকাল জীবনযাত্রা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে কাজেই চড়ক সংক্রান্তির এত বেশি আগে আর তাহাদের উৎসব লিপ্ত হইবার আবশ্যক নাই।"[৬]

হিন্দুর পূজা পার্বণের মত মুসলমান সমাজেও নানান উৎসব পালিত হয়। এই উৎসবগুলি ঘিরে গ্রামীণ মানুষগুলির যেমন তাদের ধর্মীয় আচার আচরণ পালন করে তেমনি আনন্দ অনুষ্ঠানে মেতে ওঠে। মহরমের সময় বাঙালির গ্রাম্যজীবনের দেখা যায় লাঠিখেলা, ছোরা খেলা, কুস্তি খেলা, জারি গান, পীর সাহেবদের বার্ষিক ওরস মোবারেক উৎসব উদ্যাপনকালে জিকির, খাওয়া, দাওয়া, মেলা, নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ হয়। শাহ বা পীরদের উপলক্ষে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে মাঙ্গনের ছড়া কাটা হয়। শির্ণি বিলোন হয়। গাজী, মাদার, মানিক পীরের উরস উপলক্ষ্যে বিরাট মেলা বসে। এই উৎসবগুলি সেকালে যতটা উন্মাদনার সঙ্গে করা হত এখন তার জৌলুস অনেকটাই খোয়া গেছে।

খ

সেকালে মানুষের জীবনে স্বস্তি ছিল না প্রাচুর্য ছিল না কিন্তু অবসর ছিল। মাঠে সারাবছর চাষ হত না। অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত মানুষদেরও সব সময় কাজ থাকতো না। এই অবসর বিনোদনের একটা সুযোগ করে দিত মেলা। মেলার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান যা প্রতিদিনকার হাটবাজারে পাওয়া যায় না। কেনাকাটার সঙ্গে সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ উপভোগ মেলার যাত্রীদের কাছে একটা বাড়তি পাওনা। মেলার আকর্ষণে গ্রাম থেকে গ্রামান্তর অতিক্রম করে মাইলের পর মাইল হেঁটে অগণিত নরনারী মেলায় এসে হাজির হয়। যে সমস্ত মেলাগুলি ধর্মকেন্দ্রিক সেখামে এসে ভক্তরা মানত করেন। ভক্তের কাছে যা প্রিয় বা আদরণীয় তা দেবতাকে নিবেদন করে প্রীত হয়। ভক্তরা কেউ কেউ মানত জানিয়ে মন্দির নির্মাণ দেবতার নামে পুষ্করিণী খনন অথবা দেবতার প্রত্যাদেশের জন্য 'হত্যা' দেওয়া, দণ্ডী খাটা প্রভৃতি শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করে। এখনকার দিনের মত সেকালেও মেলা উপলক্ষ্যে নানা রকম অনুষ্ঠান করা হত। তবে সেকালের মেলায় আনন্দ অনুষ্ঠানের উপকরণ অনেক ক্ষেত্রেই আলাদা ছিল। মেলা উপলক্ষ্যে কবিগান, রামায়ণ গান, তরজা, বোলানগান, যাত্রা প্রভৃত পল্লিবাসীদের কাছে বড়ই আকর্ষণের জিনিস ছিল। তবে সাধারণ জনগণের পাশাপাশি সেকালে কিছু 'উনপাজুরে' (কুলক্ষণাক্রান্ত) লোক ছিল যারা মেলায় ভিন্ন ধরনের আনন্দে মেতে উঠত। দীনেন্দ্রকুমার রায় এই আমোদ-প্রমোদ সম্পর্কে লিখেছেন-

*Journal of Cultural Research Studies, Vol-III Issue-1(2024), p73-84. (*ISSN 2583-6137)
A Blind Peer-Reviewed International Multidisciplinary Online Open Access Journal.

"মেলাস্থলে নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করা হইয়াছে নাগরদোলা, ঘোড়াবাজি, প্রভৃতি আসিয়াছিল। চাষীরা পান চিবাইতে চিবাইতে নাগরদোলায় উঠিয়া পাক খাইতেছিল। দুই তিন জন সমস্বরে গাহিতেছিল-

"যায় বুঝি যৈবনের তরী অকূল তুফানে
মদনেরই ঢেউ নেগেছে রাখতে পারিনে।"

এক পয়সায় কুড়ি পাক, কেহ কেহ দুই তিন পয়সার পাক খাইতে লাগিল। কাহারও পাশে পল্লী বারবিলাসিনী। কালো কুচকুচে রং, পায়ে মল, কটিতটে রূপার গোট বা চন্দ্রহার, দাঁতে মিসি, হাসিলে মনে হয় টিকায় আগুন ধরিয়াছে! ত্রিশ বৎসরের গত যৌবনা অভাগিনীর নাকে নোলক! কপালে টিপ, কি বিশ্রী! চেহারা, মদনের ঢেউই বটে!"[৭]

মেলা উপলক্ষ্যে অনেক বাবু কলকাতা থেকে খেমটাওয়ালি ও বাইজি ভাড়া করে আনতেন। গভীর রাতে মেলার আসরে খেমটা আরম্ভ হত। পল্লিবালকরা এ ব্যাপারে বেশ উৎসুক ছিল। তবে সেকালের সব মেলাতেই এই ধরনের আমোদ-প্রমোদ হত না।. যে মেলাগুলি এ ধরনের আমোদ-প্রমোদ হত তাতে জনগণের সামান্য অংশ যোগ দিত। উৎসব ও মেল উপলক্ষ্যে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, অতিথিদের আগমনে শান্ত পল্লিজীবন মুখরিত হয়ে ওঠে। গ্রামবাসীর সঙ্গে পরিচয় হয় শহরবাসীর। গ্রামীণ সমাজ জীবনে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার ভাব ও সংস্কৃতি বিনিময়ের মিলনক্ষেত্ররূপে মেলার জনপ্রিয়তা একালেও অনেকটা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। গ্রামীণ মানুষেরা বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে মেলার গুরুত্বের কথা মনে করে অরুণকুমার রায় লিখেছেন-

"একদিন উৎসব শেষ হয়, উৎসবকারীরা চলিয়া যান নিত্য নৈমিত্তিক বাঁধাধরা জীবনে রুজিরোজগারের সন্ধানে। গঞ্জের প্রান্তরে দাঁড়াইয়া থাকে নিঃসঙ্গ জীর্ণ ফাটল ধরা মন্দির-সারা বৎসর ধূ ধূ করে নিস্তব্ধ নির্জন উৎসব প্রাঙ্গণ। শুধু পিছনে পড়িয়া থাকে পল্লীর নিরানন্দ বৈচিত্রহীন একঘেয়ে জীবনে একটু বৈচিত্রের একটু আনন্দের স্মৃতি।"[৮]

গ

গ্রাম্য গীতি ও স্বরচিত গানের একটা ঐতিহ্য বহুদিন ধরে গ্রাম গ্রামান্তরে প্রচলিত ছিল। বিশেষ করে বিভিন্ন পালাপার্বণে এইসব গানের অনুশীলন ও প্রচার চলত টুসু ও ভাদু গান যেমন পশ্চিমবঙ্গের উত্তর পশ্চিমাংশে ব্যাপ্ত তেমনি দক্ষিণবঙ্গের গ্রামে গ্রামে ছিল গাজন গান, ঘেটুর গান, সঙের গান, বাদাই গান প্রভৃতি। গ্রামীণ বাংলার সংগীতের চারটি আঙ্গিক সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ সেকালে খেউড়, কবিগান, পাঁচালি, যাত্রা কথকতা, আখড়াই গান জনপ্রিয়তা ও সমাদর লাভ করেছিল। উনিশ শতকের বিভিন্ন গ্রন্থ ও সংবাদ সাময়িকপত্রে এর অজস্র উদাহরণ পাওয়া যায়। এই সমস্ত গীতিমূলক অনুষ্ঠানগুলির সবকটিই উৎকৃষ্ট ছিল না। এক শ্রেণির মানুষ খেমটা বা খেউড় গানে বেশ আনন্দ পেত। কালীপ্রসন্ন সিংহ খেউড় সম্পর্কে লিখেছেন-

*Journal of Cultural Research Studies, Vol-III Issue-1(2024), p73-84. (*ISSN 2583-6137)
A Blind Peer-Reviewed International Multidisciplinary Online Open Access Journal.

> "তোপ পড়ে গিয়েচে, পূর্ব্বদিক ফরসা হয়েছে, ফুরুফুরে হাওয়া উঠেচে ধোপাপুকুরের দলেরা আসোর খেউড় ধল্লেন, গোড়াদের "সাবাস"! "বাহবা"! "শোভান্তরী"। "জিতা রও"। দিতে দিতে গলা চিরে গেলো; এরই তামাসা দেখতে যেন সূর্য্যদেব তাড়াতাড়ি উদয় হলেন। বাঙ্গালীরা আজো এমন কুৎসিত আমোদে মত্ত হন বলেই যেন-চাঁদ ভদ্রসমাজে মুখ দেখাতে লজ্জিত হলেন। কুমুদিনী মাতা হেঁট কল্লেন।"[৯]

এই খেউড় পরিবর্তীতে কবি গানে রূপান্তরিত হয়। শহর গ্রাম সবজায়গায়ই কবিগানের জোয়ার আসে। সেকালে কবির লড়াই চলত চাপান-উতোরের মধ্য দিয়ে। এক দলের প্রশ্নপ্রতিষ্ঠা 'চাপানে'র জবাবে অন্য দলের খণ্ডনের পন্থা 'উতোর'। এভাবেই রসকলহের মধ্য দিয়ে জমে উঠল কবির গান। ধর্মের সীমায় এর সূত্রপাত হলেও প্রায়শই তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থেকে তা সরে যেত। রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যে তারই সাক্ষ্য-

> "ধর্মভাবের উদ্দীপনাতেও নহে, রাজার সন্তোষের জন্যও নহে, কেবল সাধারণের অবসররঞ্জনের জন্য গান-রচনা বর্তমান বাংলায় কবিওয়ালারাই প্রথম প্রবর্তন করেন।"[১০]

সেকালে অনেকগুলি কবি দল গড়ে ওঠে। তবে সব দলই প্রতিষ্ঠা পায়নি। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকর'-এ লেখেন-

> "তৎকালে যদিও অন্যান্য দল ছিল, কিন্তু হরু ঠাকুর, নিতাই দাস এবং ভবানী বণিক্ এই তিন জনের দল সর্ব্বাপেক্ষা প্রধানরূপে গণ্য ছিল।"[১১]

শ্রোতার চাহিদায় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কবিগানে অশ্লীলতা ঢুকে পড়ে। নিতাই দাসের গানের প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর স্মৃতিকথায় জানায়-

> "[সখীসংবাদ ও বিরহ গীতির] ভাবার্থ গ্রহণে অক্ষম হইয়া ছোট লোকেরা চিৎকার পূর্ব্বক কহিল: হ্যাদ্ দেখ লেতাই [নিতাই] ফ্যার যদি কাল্ কুকিলির গান ধল্লি, তো, দো [দুয়ো] দেলাম, খাড় [খেউড়] গা। নিতাই তচ্ছুবনাৎ মোটা ভজনের খেউড় ধরিয়া তাহারদিগের অস্থিরচিত্তকে সুস্থির করিলেন।"[১২]

কলকাতার বাবু সম্প্রদায় এবং রাজা মহারাজা প্রভাবিত সাংস্কৃতিক অতীত ইতিহাসে যাত্রাগানের একটা বিশেষ মর্যাদা ছিল। গীতিপ্রধান এই যাত্রাগানে ক্রমশ চটুল উপকরণ সংযোজিত হয়। কবিগান, আখড়াই, বাইনাচ যুক্ত হয় যাত্রাপালায়। ফলে উনিশ শতকে যাত্রাগান একটা তাৎক্ষণিক জনপ্রিয়তা লাভ করতে পেরেছিল। এইসময় আবালবৃদ্ধবনিতা রসিক দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য নৃত্য-গীত-বাদ্য সহযোগে অলৌকিক ঘটনার অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়। আজব ঘটনা, উদ্ভট সাজসজ্জা, নানা ধরনের সং, ভাঁড় চরিত্রের প্রগলভতা পরিবেশন রীতিমত রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এধরনের একটি নতুন বিষয় খুব সহজেই গ্রামীণ মানুষকে আকর্ষণ করতে পেরেছিল। এইসময় পেশাদারী যাত্রাপালার সাথে সাথে সখের যাত্রাদল তৈরি হয়। 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় জানানো হয়-

> "শারদীয় পূজাকালীন তত্রস্থ সৌখিন বাবুসকলে সখ করিয়া সখের বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা শ্রীযুত তারিণীচরণ কবিরাজের বাটীতে সর্ব্ব মনোরঞ্জনার্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন সেই কাব্য অল্প দিবসের মধ্যে এমত অপূর্ব্ব হইবেক আমারদিগের স্বপ্নের অগোচর আবালবৃদ্ধ ললনা কুলবধূপ্রভৃতি তদ্দর্শনার্থ বৈদ্যরাজের ভবনে গমন করিয়া সর্ব্বশর্ব্বরী আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া যাপন করিয়াছিলেন।"[১৩]

তখনকার দিনে জমিদারি পৃষ্ঠপোষকতায় এবং স্থানীয় মোড়ল-মাতব্বরদের পরিচালনায় গ্রাম্য মেলা-উৎসবে পেশাদারী যাত্রাদলের অনুষ্ঠান বসত। পেশাদারী যাত্রাদল ও পুতুলনাচের দলের খরচ খরচা নির্বাহের জন্য গ্রামে জুয়া খেলার আসর বসানো হত। অন্যদিকে মুসলিম পল্লিতে ভাঁড় যাত্রার আসর বসতো। এ যাত্রাটি ছিল অশ্লীল অঙ্গভঙ্গিসহ মহিলা শিল্পীদের নিয়ে নাচ-গানের আসর। অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট বলে ভদ্রলোকেরা সে যাত্রার আসরে না গেলেও সমাজের নিম্নবর্গের জাতিগোষ্ঠীর লোকেরাই ছিল সে যাত্রার আসল সমঝদার ও পৃষ্ঠপোষক। আবহমানকাল থেকেই কীর্তন বাংলার তথা বাঙালির আপন সম্পদ। উত্তরাধিকার সূত্রেই কীর্তন হয়ে উঠল উনিশ শতকী বঙ্গসংস্কৃতির অভিন্ন অঙ্গ। এইসময় মনোহরসাহী পরগনার পাশাপাশি বর্ধমানের 'রেনেটি' আর খেতুর রাজসাহীর 'গড়াণহাটি' অঞ্চলের কীর্তনের ধারা মিলেমিশে যায়। বঙ্গমানুষের একত্রিত নাম- কীর্তনের আকরে এক নতুন চেহারা পায়-সঙ্কীর্তন। সেকালের মত একালেও গ্রামের অসংখ্য মানুষ কীর্তনের আনন্দে অশ্রুসিক্ত হয়।

কবিগান, যাত্রা, কীর্তন যাই হোক না কেন সেকালের মানুষ তাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করতো। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেখেন-

> "এখন বাঙ্গালায় বক্তা অধিক, পূর্ব্বকালে শ্রোতা অধিক ছিল। মহাজনদের গীত শুনিতে তখন বিস্তর লোক একত্র হইত। পাঁচ-ছয় ক্রোশ দূর হইতে শ্রোতা ছুটিত। এক এক স্থানে দশ বার হাজার লোক বসিয়া কীর্তন, যাত্রা, কবি, কথকতা শুনিত। প্রায়ই কোন বাটীতে এত শ্রোতার স্থান হইত না; বোধ হয় তাহাই বারইয়ারি আরম্ভ হয়।... যেখানে দশ হাজার শ্রোতা একত্রে সেখানে 'ভাদ্রের ভরা' নদীর ন্যায় একটা কল্লোল ধ্বনি ওঠে। শ্রোতারা নিঃশব্দ নিস্পন্দ থাকিলেও সে কলরবের অভাব হয় না, যেন কোথা হইতে উঠিয়া আকাশ ব্যাপিতে থাকে।"[১৪]

ঘ

বহুপ্রাচীনকাল থেকেই গ্রামের মানুষের জীবনে খেলাধুলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এইসব খেলার বাহ্যিক উপকরণ যৎসামান্য হলেও বৈচিত্র্য কম ছিল না। কোনটি ছিল শ্রমসাপেক্ষ শরীরচর্চার খেলা যেমন-হাডুডু, কুস্তি, ছুরিখেলা, লাঠিখেলা ইত্যাদি, আবার কিছু শ্রমহীন আনন্দের খেলাও ছিল যেমন-বাঘবন্দি, ষোলঘুটি,

কানামাছি, পাতা খেলা ইত্যাদি। খেলাধুলামূলক আমোদ-প্রমোদের ব্যাপারে ছেলেদের সঙ্গে সেকালের মেয়েরাও অংশগ্রহণ করত। 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় মেয়েদের কুস্তি লড়াই-এর খবর পাওয়া যায়-

> "সংপ্রতি মোং পাতারিয়াঘাটানিবাসি শ্রীলশ্রীযুক্ত দেওয়ান নন্দলাল ঠাকুরের বাচীর সম্মুখে প্রত্যহ বৈকালে বালিকাপ্রভৃতির মল্লযুদ্ধ হইয়া থাকে। তাহাতে তত্রস্থ বাঙ্গালির বালক প্রভৃতি দুই২ জন এক২ বার মল্লযুদ্ধ করিয়া থাকে। বিশেষতো বালিকাদিগের যুদ্ধ সন্দর্শনে কে না আহ্লাদিত হন।"[১৫]

সেকালে মেয়েদের ছুরি খেলার ব্যাপারটিও একালের পক্ষে অভিনব। রণসাজে সজ্জিতা মেয়েরা ক্রীড়াঙ্গনে এসে দু'দলে বিভক্ত হয়ে যান। এক দল অপর দলকে হারিয়ে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। একদল ঘাতক অপর দল আত্মরক্ষক, ঘাতক- সংহারক। চারিদিকে দর্শক। আক্রমণের মধ্য দিয়ে তালে তালে এগিয়ে যায় খেলা। দর্শক, খেলোয়াড়, বাদক সকলেরই শিরায় শিরায় রক্ত চড়ে। চলে হৈ হৈ, চলে গান-

> "তোরা রক্ত দেখে যা, তোরা রক্ত মেখে যা তোরা অস্থি দিয়ে খট-খটাখট খঞ্জনি বাজা তোরা লাল শাড়ি আর শ্মাশন ছাইয়ে আপনারে সাজা।"[১৬]

মেয়েরা যখন এই শক্তির খেলায় নিজেদের বাহুবলের, নিজেদের সাহসের পরিচয় দেয় তখন ছেলেরাও কিন্তু দর্শকের আসনে সীমাবদ্ধ থাকত না। তারাও প্রাঙ্গণে লাঠি, বর্শা, অসি, ছোরা খেলায় মত্ত হয়ে পড়ে।

সময় ও সমাজ পরিবর্তনের জন্য খেলাধুলার পরিচয়ও পাল্টে যাচ্ছে। যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা যতই সহজ হচ্ছে ততই বহু বিদেশী খেলা স্বদেশে, শহরের বহু খেলা গাঁয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু গাঁয়ের খেলা খুব একটা শহরে চলে আসছে না। না আসার কারণ বোধ হয় শহরবাসী গতি ও সময়ের আইন কানুনে বাঁধা। শঙ্কর সেনগুপ্ত এ সম্পর্কে বলেন-

> "গ্রামবাসী জীবনধারণের জন্য যতটুকু গতির দরকার তার বেশী গতিতে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ঘড়ির কাঁটা ধরে নিয়মমাফিক কাজ করতে প্রায়শই রাজী হয় না তারা। সহরে সমস্ত কাজই ঘড়ি ধরে চলে। আমোদ-প্রমোদ-ক্রীড়াদির জন্যও ঘণ্টা মিনিট বাঁধা।"[১৭]

উপসংহার:

সময়ের হাত ধরে গ্রাম সমাজের পরিবর্তন ঘটেছে। পথঘাটের সংস্কার বিদ্যুতের ব্যবহার অধিকাংশ গ্রামেই হচ্ছে। ঘরবাড়ি, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, জীবন জীবিকায় স্বনির্ভরতা ও আধুনিকতার প্রতি মোহগ্রস্ততা প্রভৃতি নিয়েই গ্রাম আজ এক পরিবর্তনের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। এই পরিবর্তন যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়েই ঘটছে। একদিকে যেমন শহরের বিস্তার ঘটছে তেমনি গ্রামীণ সংস্কৃতিও প্রভাবিত হচ্ছে নানা ভাবে। গ্রামীণ বিনোদনের উপকরণ ও ধরন পাল্টে যাচ্ছে। আঠার শতকের বাংলার গ্রাম সম্পর্কে অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ লিখেছেন- 'তখন গ্রাম-জীবনে গতি ছিল না, কিন্তু গ্রামগুলি ছিল 'শ্রীমণ্ডিত'।'সমগ্র উনিশ শতকে তা কিছুটা বজায় থাকলেও এই শতকের

শেষ দিকে গ্রামগুলি অনেকটাই হতশ্রী হয়ে পড়ে এবং গ্রামের উৎসব অনুষ্ঠানের বৈভব ম্লান হয়ে আসে। পল্লীচিত্রে দীনেন্দ্রকুমার দুঃখ করে লিখেছেন গ্রামের দোল-উৎসবের সেই জৌলুস আর নাই। গ্রামের মানুষের আনন্দলাভের উপকরণ ছিল দীর্ঘকাল কীর্তন, কথকতা, যাত্রা, পাঁচালিগান, নৃত্যানুষ্ঠান ইত্যাদি। কিন্তু আজ এসব উপকরণ গ্রাস করেছে সিনেমা, বেতার, দূরদর্শন। সুদূর গ্রামাঞ্চলেও ঢুকে পড়েছে কেবল্ কিংবা ডিস এ্যান্টেনা। সেখানে যেকোন সামাজিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মাইকের ব্যবহার বেশ চোখে পড়ার মত। সঙ্গীতে যে সব বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ছিল এককালে অপরিহার্য, আজ সেই একতারা, বেনা, দোতারা, সারিন্দা কিংবা ঢাক, ঢোল, কাঁসি, বাঁশি, ভেঁপুর স্থান গ্রহণ করেছে হারমোনিয়াম, তবলা, গীটার, বেহালা ইত্যাদি যন্ত্রগুলি।আবহমানকালের গ্রামীণ বিনোদন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত হচ্ছে। নতুন নতুন বিনোদনের উদ্ভব ঘটছে। এক্ষেত্রে মোবাইলের ব্যবহার ও প্রসারতা বিনোদন জগতকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। শহর জীবনের আমোদ-প্রমোদকে গ্রামের মানুষ মিলিয়ে মিশিয়ে নিচ্ছে। পুরনো আমোদ-প্রমোদও নতুন মোড়কে দেখা দিচ্ছে। গ্রামের সহজ সরল প্রকৃতিকেন্দ্রিক আনন্দকে ফিরে পেতে শহরে মানুষ আগ্রহ প্রকাশ করছে। গ্রামীণ সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের কাজ চলছে। এতে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে গ্রামীণ বিনোদনকে শহর-নগর উভয় সমাজের মানুষ ফিরে পেতে চাইবে। কারণ নগরায়ণের চাপে মানুষের জীবনে যে অস্থিরতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে তা থেকে মুক্তি লাভের জন্য অন্যান্য অনেক কিছুর মত হারিয়ে যাওয়া গ্রামীণ বিনোদনও মানুষের জীবনে স্বস্তি এনে দেবে।

তথ্যসূত্র:

সাহিত্য, বৈশাখ ১৩০৩।

হুতোম প্যাঁচার নক্শা, সমাজকুচিত্র, পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব, সম্পা-ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সজনীকান্ত দাস, কলিকাতা ১৩৯১।

তদেব

ভারতী, কার্তিক ১৩০৩।

সাহিত্য, পৌষ ১৩০২।

পল্লীবৈচিত্র, দীনেন্দ্রকুমার রায়, প্রথম আনন্দ সংস্কারণ, কলকাতা ১৩৮৯।

সেকালের স্মৃতি, দীনেন্দ্রকুমার রায়, কলকাতা ১৩৯৫।

পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা, অশোক মিত্র, নিউ দিল্লি ১৯৯১।

হুতোম প্যাঁচার নকশা (প্রাগুক্ত।

লোকসাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলকাতা ১৩৬২। দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলকাতা ২০০৬।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সম্পা-ভবতোষ দত্ত, সংশোধিত

তদেব।

সমাচার দর্পণ, ১৪ জানুয়ারী ১৮৩২।

বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন ১২৮৯।

সমাচার দর্পণ, ৭ এপ্রিল, ১৮২৭।

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, শঙ্কর সেনগুপ্ত, কলকাতা ১৯৭২।

তদেব।

অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা:

সংবাদপত্রে সেকালের কথা ১.২, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত ও সম্পাদিত, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৫৬ মাঘ ১৩৫৬।

উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতি, সম্পা-স্বপন বসু, ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, কলকাতা ২০০৩।

বিশ শতকের বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতি, সম্পা-স্বপন বসু, হর্ষ দত্ত, কলকাতা ২০০০।

বাঙলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতি, আলমগীর জলিল, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৮৫।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৬৮ বর্ষ ১-৪ যুগ্ম সংখ্যা ১৩৬৯।

ভারতবর্ষ, ৫০শ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০।